Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.59-69
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

কবিতা সিংহের কবিতা: নারীর অন্তর্বয়ান

ডঃ নন্দিতা দাস

সহকারী অধ্যাপিকা জগন্নাথ সিং কলেজ, উধারবন্দ, কাছাড়, আসাম, ভারত

Abstract:

Born on 16th October,1931 in Kolkata and recognised as the first feminist of Bengali literature Kabita Singha's works speak volumes ventilating the fiery spirit within her concerning the everyday real-life ordeals women have to undergo frequently in a male-dominated society.Through her work she has tried to portray the real image of an Indian woman who needs to rediscover her voice dodging the stereotype societal forces which take her into clutches to inflict oppression and suppression on her ; to victimize and marginalize her. As Kabita Singha,s accountability lies with the humanity at large she makes her poetry speak of the marginalised status of the modern women who keep challenging the patriarchal code of conduct. Therefore, in tune with her poetic outpouring this paper seeks to examine how Kabita Singha, with the language of women presents the modern women unfold their psyche in the process of raising their voice against unjust male domination.

Key words: Patriarchy, Gender-discrimination, Feminist, Oppression, Suppression.

কবির জন্ম ১৬ অক্টোবর ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে, কলকাতায়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা ইংরেজি কবিতা। (১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে 'নেশন' পত্রিকায়। কবির ছদ্মনাম ছিল সুলতানা চৌধুরী, কবিতা, বীথিকা) প্রকাশিত হয়েছে তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'সহজ সুন্দরী','কবিতা পরমেশ্বরী', 'হরিণাবৈরী', তাছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও রয়েছে তাঁর ছয়টি উপন্যাস ও একটি নাটক। একই সঙ্গে কবির সম্পাদিত গ্রন্থও আছে। কবির ছয়টি উপন্যাস হচ্ছে 'সোনারূপার কাঠি', 'পাপ্যপুণ্য পেরিয়ে' 'সরমা', 'খুনের সংখ্যা এক', 'তুর্কী' 'হারামে চারজন', 'রাগী যুবতী', 'সেই উত্তম নায়ক'। তবে কবিতার সঙ্গে যার 'সংযোগ আজন্ম' তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যে কাব্য হবে, তা বলাই বাহুল্য মাত্র। প্রগাঢ় নারীসত্তার উপস্থিতি এবং ভিতরের আলোড়ন থেকে কবিতা সিংহের কবিতার পদযাত্রা। তাই তো কবি ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন- 'আমার ভিতর থেকে তার জন্ম হয়ে চলেছে'।

কবিতা সিংহ পঞ্চাশের দশকের উল্লেখযোগ্য কবি ব্যক্তিত্ব। যদিও পঞ্চাশের দশকে তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, তবুও সমালোচক কিংবা প্রাবন্ধিকেরা একথা মেনে নিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাবন্ধিক সুতপা ভট্টাচার্যের মন্তব্য- "বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকে, যখন মেয়েরা আজকের তুলনায় অনেক বেশি সংস্কারবদ্ধ, যখন অর্থনৈতিক তথা পারিবারিক স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে হাতে গোনা

কয়েকজন, যখন মেয়েরা মিল খুঁজে পাচ্ছে না ব্যথায় আর বুদ্ধিতে, শক্তিতে আর ইচ্ছায়। আশ্চর্য নয়, পঞ্চাশের দশকের কবিতার পত্রিকাগুলি ওলটালে মেয়েদের নাম সূচীপত্রে পাওয়া যায় না বললেই হয় ।

নবনীতা দেবসেন জানিয়েছেন, তিনি যখন সবে লিখতে শুরু করেছেন, সেই পঞ্চাশের দশকেই, তখন 'আধুনিক' কবিতা লিখতেন মাত্র চারজন মেয়ে রাজলক্ষ্মী দেবী, হেমা হালদার, শিপ্রা ঘোষ আর কবিতা সিংহ। নবনীতাকে নিয়ে এঁদের সংখ্যা হলো পাঁচ। এঁদের সকলেরই আধুনিকতার পরিচয় পঞ্চাশের দশকেই যে পরিস্ফুট হয়েছিল তা হয়তো বলা চলে না।... কবিতা সিংহের কোন কবিতা বই সে সময় প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু আত্মা অনুসন্ধানের যন্ত্রণাময় পথ-পরিক্রমার সূত্রপাত সে সময় একমাত্র তাঁর কবিতাতেই দেখেছি। পঞ্চাশের মহিলা কবিদের মধ্যে তিনিই প্রধানতম'[১]

প্রাবন্ধিকের মন্তব্য থেকে একথা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে পঞ্চাশের দশকের সার্থক মহিলা কবি কবিতা সিংহ। এমন কী পরবর্তী উত্তরসূরি অর্থাৎ ষাটের, সত্তরের, আশির, নব্বই এর তেজস্বিনী মহিলা কবিদের সার্থক পূর্বসূরী তিনিই এবং তিনিই পথ প্রদর্শক মূলত, আজকের নারী কবিদের নিজস্ব ভাষা চেতনা যেভাবে তাঁদের কবিতায় ফুটে উঠছে, তার মূলসুর ছিল কবিতা সিংহেরই কবিতায়। তাইতো কবি রমা ঘোষ উচ্চারণ করেন-

"তোমার চলে যাওয়া পথের ধুলো ভেঙে
কুড়িয়ে নিই আমি রক্ত উৎপল।
তোমার অভিমান তোমার ভালোবাসা
কাঁটার লাঞ্ছনা আহত পরাভব
বেতের ঝাঁপি ভরে করেছি সঞ্চয়।
আমার চলা পথে চকিত চোখে পড়ে
তুমি যে ঘাসবীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলে
এখন অঙ্কুর জানায় সঙ্কেত।"

('কবিতা সিংহ, স্মরণীয়াসু': 'নার্সারি রোড')

আত্মআবিষ্কারের তীব্র যন্ত্রণা কবিকে বারবার প্রাণিত করেছে। কবি খুঁজে ফিরেছেন নারীর আত্ম-প্রতিষ্ঠাকে। পুরুষতন্ত্রের সেই পরম্পরার মধ্য থেকেই জীবনের নতুন বলয়ে, কবিতার জগতে পর্দাপণ করেছেন তিনি। তাঁর কবিতায় নারীকে দেখা যায় সাদাসিধে প্রাত্যহিক বাতাবরণে। দেখা দিয়েছে নানা রূপে।

আসলে, কবিতা সিংহ নারীর প্রতিদিনের বাস্তবতা থেকে তুলে আনেন তাঁর নিজস্ব বয়ান। তাঁর দায়বদ্ধতা মানবতার কাছে, মানুষেরই কাছে। নারীর ভাষা এতো স্বাভাবিকভাবেই তুলে আনেন কবি তাঁর কবিতায়। মেয়েদের জীবন জগৎ সমন্ধে তিনি সচেতন বলেই। এ তাঁর দায়বদ্ধতারই পরিচয়। কবিতায় মেয়েলি ভাষাভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে পারেন তিনি। কবির কবিতায় নারীর ব্যথাগুলি শুষে নিয়ে উঁকি দেয় আত্মপ্রক্ষেপের স্বরলিপি। বহুস্বরিক কাব্যবাণী ধরা দেয় এভাবে-

"না, আমি হব না মোম
আমাকে জ্বালিয়ে ঘরে তুমি লিখবে না।

হবো না শিমূল শস্য সোনালী নরম
বালিশের কবোষ্ণ গরম"।

('না': 'সহজ সুন্দরী')

মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনের লড়াই এর ইতিহাসের কথা কবিতা সিংহ তাঁর কবিতায় লিখে রাখেন এভাবেই। সংসারে মেয়েদের পরিস্থিতির কত দিকই না দেখেছেন কবি। মেয়েলি অর্ন্তলোকের উপরই কবির বেশি ঝোঁক। যাপিত জীবনের সুখ ভোগ তাঁকে ক্লান্ত করে, তাই কবি কল্পনায় শান্তিকে খুঁজে পেতে চান। কবিতার পরম্পরা, শিল্পের পরম্পরা, সর্বোপরি ভাষার পরম্পরাকে এড়িয়ে কবিতা সিংহ একক প্রতিবাদী কবি। ববি সচতেনভাবেই প্রয়াস করেছেন পুরুষতান্ত্রিক বেড়াজালকে ভেঙে দিতে। তাই কবিতার বয়ানে বদল ঘটেছে কিছুটা। নারীর জবানীতে তিনি লিখেছেন-

"কিছুকি আলাদা রাখো?
শসীবৃক্ষে রমনী হে একা?
সত্যকার এলোচুল সত্যকার রমনী-নয়ন।
সত্যকার স্তন?
খুলে রাখো নিজস্ব ত্রিকোণ?"

('পৃথিবী দেখে না':'সহজ সুন্দরী')

আমাদের চিরাচরিত ভাবনাকে সচেতনভাবেই ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার দুঃসহ পথে হেঁটেছেন কবি। বড় হয়ে উঠেছে জীবনের প্রতি অকপট আত্মসম্পণ। সংস্কারমুক্ত কবি নৈসর্গিক জীবন যাপনের দৃশ্য বা ছবিকে কবিতায় রূপ দিলেন। কবির অন্তরের অভিজ্ঞতাই কবিতাকে তাৎপর্যময় করে তুলেছে। কবির কবিতার ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয় এক আত্মজিজ্ঞাসা। যেহেতু কবিতা কোন স্থির ব্যাখ্যার বিষয় নয়, আঙ্গিকগত কোন দুরূহতা, আবেগ-উচ্ছ্বাস বা প্রগলভতা নয়, এ যেন পাঠককে ক্রমশই সংকেত বিশ্বে ধাবিত করে। কবির কবিতায় তাই শুনি-

"বাতাসে একেলা যায় গর্জনের বীজ
দুলে দুলে চলে যায় এক প্রজন্মের থেকে
ইতিমধ্যে ঘটে যায় দ্রুতবেগে উত্থান পতন
মরে বাঁচে যুদ্ধ করে মানুষের সূর্যসত্যতা।"

('প্রকৃত বিপ্লব': 'সহজ সুন্দরী')

এভাবেই জীবনকে প্রত্যক্ষ করেন কবি চেতনাঋদ্ধ ভাষায়। পুরুষসর্বস্ব জগৎকে প্রত্যাখান করেন না কেবল, বিকল্প ছবিও কবির কাছে স্পষ্ট।

পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে যেহেতু কবিতা সিংহ স্বতন্ত্র ধারার কবি। যদিও যশস্বী কবি হিসেবে ততটা মর্যাদা পাননি, কারণ সেকালের সমাজ নারীর এমন সোচ্চার কণ্ঠকে মেনে নিতে পারে নি। কবিতায় নারীর এমন পরিসর গড়ে নেওয়া নিয়ে সোরগোল উঠেছিল। কিন্তু বিরূপ সমালোচনার ধুলো উড়িয়ে কবি এগিয়ে গেছেন। প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন, দুর্নীতি ও পারিবারিক জীবনে নারীর প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য মূলত পঞ্চাশের দশকের প্রথম পালাবদলের সূচনা হয়েছিল। অবশ্য বাংলা কবিতার জগতে সৃষ্টিশীল

কবির চাঞ্চল্য ও সুগভীর অনুভবের বোধই তখনকার পাঠককে করেছে সমৃদ্ধ। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র প্রথম কবিতাটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে-

"অপমানের জন্য বার বার ডাকেন
ফিরে আসি
আমার অপমানের প্রয়োজন আছে!
ডাকেন মুঠোয় মরীচিকা রেখে
মুখে বলব বন্ধুতার বিভূতি-
আমার মরীচিকার প্রয়োজন আছে।"

('অপমানের জন্য ফিরে আসি':'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

পাঁচটি স্তবকে বিভক্ত কবিতাটির বিষয় বস্তু ভিন্নতায় অনন্য। কবির অন্তর্দাহের কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ছিন্নমূল মানসিকতা কাজেই কবিতায় কবি উষ্ণতার সুরে বলেন 'অপমানের জন্য বার বার ডাকেন' নারীকে মানুষ হিসেবে স্পৃহনীয়ও গ্রহণীয় বলে দেখতে শিখুক আমাদের সমাজ। তবে কবি কবিতায় মধুর স্বাদকে এড়িয়ে চলেন নি, কাজেই কবিতার বয়ান হয় এভাবে-

"অপমানের জন্য বার বার ডাকেন
ফিরে আসি
উচ্চৈঃ শ্রবা বিদূষক সভায়
শাড়ি স্বভাবতই ফুরিয়ে আসে
আমার যে কার্পাসের সাপ্লাই মেলে না।"

('অপমানের জন্য ফিরে আসি':'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

সনাতন মূল্যবোধ, সৌন্দর্য ও কল্যাণকে কবি প্রশ্ন করেন। এসবের পিছনে যে লুকিয়ে আছে আত্মহননের পথ, তা কবি অনুভব করেছিলেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতারও যে পরিবর্তন একটি বড় অংশ কবি তা টের পান। ধ্রুবসত্য, ধ্রুববিশ্বাস, পবিত্রতা এসবকে প্রশ্ন করেন কবি-

"অপমানের জন্য বার বার ডাকেন-
ফিরে আসি
ঝাঁপ খুলে লেলিয়ে দেন কলঙ্কের অজস্র কুকুর
আমার কলঙ্কের প্রয়োজন আছে"

('অপমানের জন্য ফিরে আসি' 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

জীবনের পথে নারীর পরিচয় চান কবি, তাই কবি বলেন 'আমার কলঙ্কের প্রয়োজন আছে'। অদম্য প্রাণশক্তির তাগিদে কবি এরকম বাণী উচ্চারণ করতে পারেন। নারীর নিভৃত মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে কবির কবিতায়।

"যুদ্ধরীতি পাল্টানোর কোন প্রয়োজন নেই
তাই করমর্দনের জন্য
হাত বাড়াবেন না।

আমার করতলে কোনো অলিভচিক্কণ কোমলতা নেই”

(‘অপমানের জন্য ফিরে আসি’: ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’)

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের কবির এমন বলিষ্ঠ, চেতনাবদ্ধ উচ্চারণ পাঠককে চমকে দেয়। বাংলা কবিতায় নারী কবিদের উনিশ শতক থেকেই দেখা গেছে ঠিকই, কিন্তু নারীর কথা, নারীর বয়ান ধরা পড়েছে কবিতা সিংহের মতো কবিদের হাত ধরেই। যদিও সেখানে জীবনের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, কামনা বাসনা, প্রেমের প্রশান্তি, আবেগের দাহ সবকিছু মিলেই কবিতার অবয়ব গড়ে উঠেছে।

‘যে ভেবেছে যারে তারই সব দ্বার রুদ্ধ থাকে
রুদ্ধ দ্বারের কাঠে কাঠে ঘোর যুদ্ধ থাকে
ধন্ধ তারই তো ক্রমে খুলে দেয় অন্ধতাকে
জুড়ায় প্রবল জিদের কঠোর শুদ্ধ পাকে।’

(‘যাওয়া’: ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’)

সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে নারী জাতিকে সচেতন হয়ে উঠতে কবি আহ্বান জানান। কিন্তু এসব কবিতার পিছনে পাশ্চত্যের নারীচেতনাবাদের প্রণোদনা রয়েছে এমনটা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে একথা বলা যাবে, এসব কবিতায় মধ্যবিত্ত নারী জীবনের সাংস্কৃতিক লিঙ্গ রাজনীতির (Gender politics) কাঠামোর ছক বাঁধা পরিসর থেকে বেরিয়ে যাবার একটা আকুলতা লক্ষ করা গেছে।

“কাব্যের ঈশ্বর নেই আছেন ঈশ্বরী।
তিনি একা, তিনি নারীশ্বর।
ঈশ্বরী কি ধ্বনি দেন? চক্ষুহীন, বর্ণ বিহীন।
না তিনি দেখান তাঁর অঙ্গুলি হেলনে
চক্ষুষ্মান, সশরীর কবিতা চেহারা।”

(‘আছেন ঈশ্বরী’: ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’)

এই যে ‘ঈশ্বরী’র অর্ন্তবেদন তা অস্তিত্বের জটিলতাকেই প্রকটিত করেছে। কবিতাটি সমগ্র চেতনায় ধরা দিয়েছে। কারণ কবিসত্তার গভীর অনুভূতির গভীরতা ধরা দিয়েছে কবিতাটির অবয়বে।

“বৃথা শব্দে পাপী যত, ছদ্ম পূজারী, তিনি
তিনি নেত্রে করেন দাহন,
কচিৎ কখনো কেউ, ফিরে আসে উৎকীর্ণ পাথর হাতে
বজ্রে উৎপাটিত।
যেমন ‘সেনাই’ থেকে নেমে এসে একেলা মোজেস’
পৃথিবীর জন্য দেন স্বর্গলোকের দশটি নির্দেশ।”

(‘আছেন ঈশ্বরী’: ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাবন্ধিক তাপস রায়ের মন্তব্য- “বাংলা কবিতায় অনেক মহিলা কবির হাতেই কবিতার সমৃদ্ধি ঘটেছে বিশেষ। সে দু’শতক আগের গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী থেকে মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, প্রিয়ংবদা দেবী, সুরমাসুন্দরী ঘোষ, কুসুমকুমারী দাশ, রাধারাণী দেবী, বাণী রায়, উমা

রায়, আরতি দাস, রাজলক্ষ্মী দেবী, হেনা হালদার, কবিতা সিংহ হয়ে সাম্প্রতিকে সমগ্র মহিলা কবি। কবিতা সিংহকে এই পর্বে প্রথম নারীত্বের উত্থানকামী কবি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই উত্থানকামীতা কি? সে কি তার একক বলয়? কোনো চেষ্টিত বাঁকবদলের অভিপ্সায় নারীবাদ প্রশ্রয় দেওয়া? নাকি শিল্পের প্রতি অবিচল আস্থায় নিজের বিশ্বাস অন্বিত হয়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতায় যেভাবে তিনি প্রতিভাত, তাতে শুধু নারী বিশ্বের কবি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার একরৈখিক ঝোঁক নেই। তাঁর ভাষা প্রক্ষিপ্ত অথচ ধূপছায়া নেই ।" প্রাবন্ধিকের মন্তব্য থেকে শুধু কবিতা সিংহ নয়, সামগ্রিকভাবে বাংলা কাব্যে মহিলা কবিদের কাব্যবিশ্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে কবি এগিয়ে গেছেন নারীসত্তার নির্মিতিতে। ঐতিহ্য বোধ কবিতা সিংহের তীব্র ছিল বলেই 'ভাঙ্গী রমণীর ক্রোধে' কবিতাটি রচনা করেছেন। তিনটি স্তবকে বিভক্ত কবিতাটি নারীচেতনার অভিজ্ঞানে নারীকথন হয়ে ওঠেছে।

"ভাঙ্গী রমণী একা তাকাল উরুর দিকে তার
কালো ত্বক বেয়ে ক্রমে অর্থহীন নামে রক্তধারা,
এতদিন তার, চোখের কোটরে শুধু গাঢ় ভয় ছিল
বড় অন্ধ, অসহায় ভয়
গভীর সন্ত্রাস ছিল সঙ্কোচ বেদনা
নিজের আজন্ম পাপ জন্ম অস্পৃশ্যতা
অপবিত্র শিশু স্বামী আত্ম পরিজন
আকাশ নদী ও ভূমি শস্যের মতন
মৌল শুদ্ধতাকে-
দখল করেছে বলে অপরাধে বড় ছোট ছিল
রক্তের মোড়কে রাখা মজ্জাগত গাঢ় অশৌচ
যাঁতার মতন তার বুক ভেঙে পিষেছে বিস্বাদ।"

('ভাঙ্গা রমণীর ক্রোধের': 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

পুরুষতান্ত্রিক পণ্যসর্বস্ব মানসিকতার বিরুদ্ধে কবির এমন বয়ান, পাঠককে আপ্লুত করে। নারী অস্তিত্বের নিপীড়িত সত্তাকে কবি চিনিয়ে দেন-

(ক) 'নিজের আজন্ম পাপ জন্ম অস্পৃশ্যতা'
(খ) 'তবু আজ, তার নগ্নতার আর বাকি নেই'
(গ) 'এখন ভিতরে তার শুধু ক্রোধ শুদ্ধ ঘোর ক্রোধ'
(ঘ) 'স্পৃশ্যতার কূটকচাল আজ জেনে গেছে ভাঙ্গী রমণী' ।।

কবি অস্তিত্বের খোঁজে কবিতায় নারীসত্তাকে নির্মাণ করেন। নারীর জীবন সংগ্রামের অন্যতম দিকগুলোকে প্রতীকোচিত করেছেন। চেয়েছেন সুস্থ সুন্দর লিঙ্গ নিরপেক্ষ সমাজ। স্বপ্ন দেখেছেন নতুন সময়ে নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার। কবি বিচ্ছিন্নতাবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন লিঙ্গ রাজনীতির গতিপ্রকৃতি কবিকে সচেতন করেছে। 'ভাঙ্গী রমণীর ক্রোধে' কবিতাটি তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ-

"শুধু দুই চক্ষু নয় ধক ধক্ কপালের চোখ

জ্বলে উঠে পেতে চায় পদতলে রাজপুত লোক
ক্রোধ তার জ্বলে উঠে বুক থেকে অন্য বুকে যায়
উড়ন্ত সর্পের মত ভয়হীন পায়ের তলায়
পিষে যায় লোক নয় পোক্
ভাঙ্গী রমণীর শাপে খাক্ হোক
ব্রাহ্মণের দর্প যাক হোক।"

('ভাঙ্গী রমণীর ক্রোধে': 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

বুঝতে পারা যায়, নারীর অস্তিত্বের লড়াইকে কবি অন্তহীন পথে নিয়ে যেতে চান। মগ্নচৈতন্যে কবি আক্রমণ করেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে। স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে ভালোবাসার গান নয়, কল্পনার রংবাহারে, ছায়া স্নিগ্ধ আশ্রয়ের ওপরে, কবি আস্থা রাখতে পারেন নি। নিবিড় শান্তির আশ্রয় খুঁজতে নয়, কবি চেয়েছেন সমাজ হয়ে উঠুক লিঙ্গনিরপেক্ষ, নিগুঢ় দার্শনিক মহিমায় কবিতাকে সুসজ্জিত করেননি, কবিচিত্তে প্রতিভাত হয়েছে নারীর ভয়াবহতার অনুভূতি। কবিআত্মা প্রবহমান নারীসত্তাকে ধরতে চেয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেড়াজাল থেকে মুক্তির তাড়নায় কবি কবিতার জগতে পদার্পণ করেন। নাগরিক ব্যক্তিজীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার হননি, তিনি, হয়েছেন নারী জীবনের বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার। তাই কবির ব্যক্তিসত্তা নিজেকে নারীর সামূহিক জীবনের সাথে একাত্ম করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্ট সামাজিক অবিচার, অসুস্থতার মূলটা কোথায় এবং তা থেকে মুক্তির উপায়ই বা কি, তা-ই কবির অন্বেষণ।

"তারপর চলে যাও বিরাট রাজার ঘরে-
আহা যেন স্মৃতিভ্রষ্ট অজ্ঞাত বাসিনী
খুলে রেখে চলে যাও সত্যকার ব্রোণী
হাসো তুমি অপমানে ছিন্নভিন্ন, হাসো বিমোহিনী"

('পৃথিবী দেখেনা': 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

বলাবাহুল্য, কবির প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'সহজসুন্দরী', 'কবিতা পরমেশ্বরী', 'হরিণাবৈরী', তাছাড়া 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' অবলম্বনে কাব্যবিচার করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবির কাব্যভুবন। কবি ভাবনায় নারী চেতনাবাদ কতটুকু কাজ করেছে, এবং নারী কবির যে জয়যাত্রা সূচিত করেছিলেন পঞ্চাশের কবিরা, তা কবির কবিসত্তাকে নাড়া না দিয়ে বোঝা যায় না। কবি জীবনজুড়ে নারীসত্তার এই হাহাকারের অস্তিত্ব অনুভব করেই থেমে থাকেননি, আন্তরিকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন এই হাহাকারের মূল কথা। শ্রেণীবৈষম্যহীন, লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন কবি, যা আজও বহমান মহিলা কবিদের কাব্যসৃষ্টির ভুবনে।

কবির প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সহজসুন্দরী'। প্রথম কবিতা 'না'। তেজস্বিনী কবির প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয় এভাবে-

"কবিতা লেখার পরে বুকে শুয়ে ঘুমোতে দেব না।
আমার কবন্ধ দেহ ভোগ করে তুমি তৃপ্ত মুখ;
জানলে না কাটামু ঘোরে এক বাসন্তী অসুখ

লোনা জলে ঝাপ্সা করে চুপিসাড়ে চোখের ঝিনুক।''

('না': 'সহজসুন্দরী')

ষাটের দশকে একজন নারীর কলমে এমন উচ্চারণ চমক দেয় আমাদের। কারণ মেয়েরা যে অকপটে প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারণ করতে পারে, সে কথা খুব বেশি আমাদের নজরে পড়েনি। আত্মসচেতন কবিই পারেন মেয়েদের অবদমনকে ভাষা দিতে। 'মনুসংহিতা'য় যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহতি' এই নির্দেশ যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই কাঠামোকে ভেঙে দিতে চান কবিতা সিংহ।

বাংলা কবিতার জগতে পঞ্চাশের দশক থেকে নারী কবির ভাষাচেতনা যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল, তার সার্থক নিদর্শন কবিতা সিংহের কবিতা। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক তাপস রায়ের মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে - ''আত্মস্বাতন্ত্রের পথ ধরে যে নারী হৃদয়ের উত্থান তাকে সহজ সংক্ষোভ দিয়ে কবিতায় প্রথম বিদ্রোহের লক্ষণাক্রান্ত করেছেন কবি কবিতা সিংহ। ৫০-এর কবিতার মূল সুর আত্মউন্মোচনকে গোটা নারী জাতির প্রশ্নের সমান্তরাল করে বাংলা কবিতায় নতুন ধারাটির তিনিই জননী। তাঁর পরাবাচনের উদ্দীপিত বার্তা, অন্তর্ঘাত কুশল প্রতিবাচন মাতৃ সম্পর্কের অনুষঙ্গে নারী চেতনাবাদ নামে বাংলা কবিতার নতুন পরিসরটিকে নির্মিতি দিয়েছে। পুরুষের দর্পণে প্রতিফলিত নারী প্রতিমার জলছবিটি মুছে বিদ্রোহিনী ইভ-এর প্রথম আবির্ভাব।''[৩]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বীভৎসতার দৃশ্যকর, দ্রষ্টা হিসেবে দেখেছেন, কবির মনে জেগে উঠেছে সংশয়, সংশয় জীবন সত্য সম্পর্কে। অন্তরের তীব্র আকাঙ্খায় কবি নিঃসন্দেহে অতিক্রম করে গেছেন পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার কাঠামোকে। কবিতায় কবি প্রগাঢ় অনুভূতিতে নারী জীবনের বিবর্ণতার ছবি এঁকেছেন। কবি জীবন যন্ত্রণার তমিস্রায় দিশাহারা হন নি, খুঁজে পেয়েছিলেন নারীর নিজস্ব জগতকে। উত্তরণে আশাবাদী কবি তাঁর সৃষ্টি কর্মের একদিকে যে ব্যথা বেদনাকে প্রকাশিত করেছিলেন, তেমনি আশাবাদী জীবনাদর্শনকেও তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। দুঃখ দুর্দশার নিদারুণতায় কবির কবিতাকে নৈরাশ্য গ্রাস করেছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে। তবু, কবির কবিতায় প্রত্যক্ষ করা যায়, নারীজীবনের অসহায় পরিস্থিতির শিকার মেয়েদের চিত্র। ফলে যন্ত্রণায় আতুর মেয়েদের ভাষা চেতনা, কবির কবিতায় অনন্য মাত্রা পেয়েছে। উদাহরণ হিসাবে দুটি পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে-

"এতখানি বলা হল, তবু কি বুঝি মা?
সংসার কেমন তোর। কেমন সংসার।
সম্পর্কের শুধু ধুলা খেলা।
চতুর্দিকে ওঠে পড়ে শব্দ মায়া, মায়াশব্দ
শব্দময় মায়া"

('বেলা যা':'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

বাংলা কবিতায় নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে তেমনভাবে লক্ষ করা যায়নি। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কবি পুরুষতান্ত্রিক আগ্রাসন নীতির ভয়াবহতা ও তার প্রক্রিয়ায় পিষ্ঠ সাধারণ মেয়েদের জীবনযন্ত্রণার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন-

"এই দেখো, যশ অর্থ কাম মোক্ষ
সব ফেলে দিয়ে
নিঙড়ে ধরেছি আয়ুষ্কাল
অয়ি তৃষ্ণাতুরা
তুমি শুষে নেবে বলে দেখো।"

('কবিতা': 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

নারীর অন্দর মহলের চিত্রকর ধরা দিয়েছে। নারী চেতনার প্রতিটি অনুভবের স্পন্দন কবির কবিতার অনুযার-রেসাত প্রতিলানিত হয়েছে। হয়তো পাঠকের অনেক কাছাকাছি পৌঁছতে পারেননি কবি। কারণ সমাজ নারীর বলিষ্ট উচ্চারণ শুনতে নারাজ। কাজেই নিপীড়িত নারী আত্মার ক্রন্দন, বঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস তাঁকে আবেগবছল কোন রোমান্টিক জগতের কেন্দ্রে আর ধরে রাখতে পারল না। কবি নারীর বন্দনা না গেয়ে নিজ অভিজ্ঞতার কথা নিজস্ব অনুভব দ্বারা ব্যক্ত করতে শুরু করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কবি নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গিতে নারীর স্বপ্নভঙ্গের বিষাদ্যাখাকে রচনা করে চলেছিলেন।

"এই দেখো। দেহ নেয় যে আমার বিমূর্ত প্রণয়
যে আমার নিমকাঠে প্রতিকোষে আয়নায় আয়নায়
যে আমার সমগ্র আমিকে করে তক্ষণে সৃজন
নিমের শরীর খুঁড়ে গড়ে দেয় কৃষ্ণ চেতনাকে
হস্তবিহীন তার খুলে যাওয়া বাড়ানো দুহাত
এই দেহ অধিবাসী আদিবাসী নিম জগন্নাথ।"

('নিমকাঠ':'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

নারীবাদী কবি হলেও কবিতা সিংহের কবিতায় বার বার এসেছে, ভালোবাসার কথা প্রকৃতির কথা। তাই বার বার তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে প্রকৃতির নিবিড় আকর্ষণ, জ্যোৎস্নার খুশির খেয়ালে মত্ত সাধারণ মেয়েদের জীবনচর্যা, তাদের প্রাণখোলা আন্তরিক স্নিগ্ধতা ।

সাধারণ মেয়েদের জীবনাচরণ ও তাদের দুঃখ বেদনার ইতিকথা রচনায় কবিতা সিংহ সিদ্ধহস্ত কিন্তু জীবনযন্ত্রণার সাথে তন্বিষ্ঠভাবে ছড়িয়ে আছে ভালোবাসার গান। তীব্র অনিশ্চয়তা, কবিকে চিন্তায় মগ্ন করলেও আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার অভীপ্সা কবিকে জীবনের দুঃখময় রূপ নয়, ভালোবাসার গান শোনায়।

"ডুবন্ত সূর্যের আর্কল্যাম্পের দিকে
দুই হাত তুলে চিৎকার করে ওঠে- থামো
দিনমনি থামো
তার প্রেম হয়েছে প্রেম হয়েছে প্রেম।"

('প্রেম': 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

'সহজ সুন্দরী: তিন' কবিতাটির সুর একটু ভিন্ন। চারটি চরণে বিভক্ত কবিতাটি পাঠককে এক অনাবিল স্তব্ধতার জগতে নিয়ে যায়।

"কাকে তুমি পাঠাও পিপাসা?

আলভিজ ছোবালা ও নীল অহিফেনে?
কার দিকে ছুঁড়ে দাও শূন্যতার অঘোর তামসী"?

('সহজ সুন্দরী: তিন': 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

নারীর অন্তরগহনের তীব্র আর্তি, চাপা বেদনা, ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন কবি। অন্ধকারের গহণে গহ্বর খুঁজেছেন কবি। নারীর সংকট, বিপন্নতা, দীর্ণতা, ছকবাঁধা নিয়মে নয়, ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় ধরা পড়েছে যা কবিতায় 'জলের পুতুল' কবিতায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

"খুব বড় বিস্তারিত জলে
ক্রমশ নিম্নে, নিচে মহিম গভীরে তুমি নারী
নেমে যাও।
তলাও সাহসে।"

('জলের পুতুল': 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

বস্তুত কবিতায় কবিতা সিংহ নারীবাদী ধ্যান ধারণাকে স্ফূর্তি দিয়েছেন। পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতায় তার সূচনাবিন্দু। কবিতার শাব্দিক বিন্যাস, ধ্বনির বিন্যাসেও ছুঁয়ে গেছে নারীর বয়ান। কোন পিতৃতান্ত্রিক সংস্কারকে, কোন প্রথাগত ছককে স্বীকার করে নয়, বিন্যস্ত করেছেন নারীর নিজস্ব স্বর। সাজিয়েছেন দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সোপানমালায়। কবিতায় বিশেষ ভাবে উকি দিয়েছে শব্দবন্ধের উচ্চারণমত তাগিদ। কবির অন্তঃ প্রেরণাকে গভীর থেকে উস্কে দিয়েছে মানবিক অস্তিত্বের অন্তরঙ্গতা। এইসূত্রে কবিতার শব্দচয়ন ও শব্দপ্রয়োগ আর উচ্চারণরীতি অনুধাবন করার মধ্যে-

"জনমানব দেখবেনা জেনেও দ্যাখো
প্রবল জ্যোৎস্নায়
নিশিন্দাবন
সব ডালপালা ঊর্ধ্বমুখে ছড়ায় ছিটায়
হা হা করে ওঠে সব সবকিছু
পরীময় কাক জ্যোৎস্নায়"

('নিসর্গ': 'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

সবমিলিয়ে কবি কবিতা সিংহের কাব্যভুবন সম্পর্কে বলা যেতে পারে, কবি পঞ্চাশের দশকের একজন উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি। বাংলা কবিতায় নারীর স্বতন্ত্র বয়ান প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। পণ্যায়িত নারীসমাজকে উপস্থাপন করেছেন কবি নারীচেতনার অভিজ্ঞানের আলোকে। দৈনন্দিন জীবনের মুখে-বেদনা, আশা-নিরাশা, নারীর অবস্থান কবির কবিতায় চিত্রকল্পে ধরা দিয়েছে। কবির কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো সূত্রাকারে এভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে-

(ক) বাংলা কবিতায় প্রথম যথার্থ নারীস্বর ধরা পড়েছে কবির কবিতায়।
(খ) নারীর বয়ান রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত।
(গ) শব্দব্যবহারে, উপমা, রূপক ব্যবহারেও লক্ষ করা গেছে নারীবাদী অভিজ্ঞানের ছাপ।
(ঘ) চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন নারীর দৈনন্দিন জীবনের চিত্রে।
(ঙ) বুদ্ধিদীপ্ত পর্যবেক্ষণে পুরুষ প্রাধাণ্য কবিতার জগতের বদলে নারীর বয়ান সচেতনভাবে ধরা পড়েছে।

উনিশ শতকের মহিলা কবিরা বাংলা কবিতার জগতে আলোচ্ছটা দিয়েছিলেন, কিন্তু তা ছিল নিতান্ত আবেগপ্রবণ কবিতা। কোথাও ছিল গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র, কোথাও ছিল দৈনন্দিন জীবনের চিত্র। যেমন- গিরীন্দ্র মোহিনীর 'চিত্রাঙ্গণ' কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে-

"রং আর তুলি নিয়ে কাটে সারাবেলা,
শুরুজন বলে ওরে একি ছেলেখেলা।
চল্লিশ হয়েছে পার,
গিরি আখ্যা গৃহে যার
গৃহকর্ম কাজকর্ম সব অবহেলা
দূর করে ফেল দেখি ছাই ভস্ম-গুলো।"

('চিত্রাঙ্গণ': 'গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী')

সুতরাং উনিশ শতকের বাংলা কবিতায় মহিলা কবিদের প্রয়াস ছিল বাংলা কবিতার ব্যাপ্তিতে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে। আর বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক থেকে মহিলা কবিরা কবিতায় নারী পরিসর গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন। কবিতা সিংহ সেই দলের পথিকৃৎ কবি। কবির আঙ্গিনাই আজ পুষ্পপল্লবে সেজে উঠছে মহিলা কবিদের প্রচেষ্টায়, যা বাংলা কবিতার জগতে এক নতুনভাবনার সঞ্চার করেছে।

তথ্যসূত্র:

1) ভট্টাচার্য সুতপা, 'মেয়েদের লেখালেখি' পুস্তক বিপনি, জানুয়ারি, ২০০৪, পৃঃ ৬০-৬১
2) (সম্পাদিত) বসু কর্মকার মিতা, 'সাতজন কবি' এবং মুশায়েরা জানুয়ারি ২০০৪, কলকাতা, পৃঃ ৬০
3) তাপস রায়, কবিতা সিংহের কবিতা, 'সাতজন কবি' বসু কর্মকার এবং মূশায়েরা জানুয়ারি ২০০৪, পৃঃ ৬৫

গ্রন্থপুঞ্জি:

ক) আকরগ্রন্থ

1) সিংহ কবিতা, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ, কলকাতা, ১৯৮৭।

খ) সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

1) আজাদ হুমায়ুন, 'দ্বিতীয় লিঙ্গ', আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৮।
2) গুপ্ত যোগেন্দ্রনাথ, 'বঙ্গের মহিলা কবি', দে'জ, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৫৩।
3) চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, 'কবিতা কী ও কেন', দে'জ, কলকাতা জানুয়ারি-২০০৪।
4) দে গোপা, 'উনিশ শতকের তিন নারী কবি', দে'জ, কলকাতা, অগাষ্ট ২০১০।